Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.129-137
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

"বধ্যভূমি"-র চতুর্গল্পে ত্রিপুরার সুজয় রায়: একটি বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা

সৌরভ দে

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারী মহাবিদ্যালয় পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত

Abstracts:

In this small state of Tripura, which is marked as the symbol of the most beautiful beauty of North East India, built on the branches of crooked hills, a shining foundation of short stories has been developed along with the practice of poetry or novels. A recurring theme across its larger backdrop is the refugee problem in its most dire form as a result of the trauma that Partition inflicted on the core of humanity. Various contexts seem to have taken place effortlessly in the arena of creative prose literature.

Storyteller Sujoy Roy has emerged as one of the faces of those who are cultivating a creative literature in the pastures of Bengali prose literature in Tripura. In every chapter of his writings the problem of Tripura's long-burning extremism, the problem of the burning chaos of partition, is visible. As the interweaving of the stories are the reports of endless love of personal life, various social and political issues have become the main motif of the story.

Sujoy Roy's published stories are 'Ae Jiban Ae Dah' (1974), 'Sharir Zameen' (1997), 'Badhyabhumi' (2002), 'Anyamukh' (2013) etc. The stories compiled in these books are a unique reflection of the real thoughts of the society.

In the context of the analytical article, Sujoy Roy's 'Badhyabhumi' story book 'Uttaradhikar', 'Fatal', 'Sekharer Dike', 'Ujaner Nabik', 'Nabaminishi' etc., has been thrown various views of the author Sujoy Roy's social, political and above all psychological tension. I have endeavored to show how reasonable the accuracy of the stories is in the actual context.

Keywords: Tripura, Displacement, Social realism, Terrorism, Partition, Psychological Tention, Political.

সৃজনী গদ্যসাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য 'ছোটগল্প'। যদিও গল্প বলা বা শোনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু রেনেসাঁসের অভিঘাতে সৃষ্ট সমাজ সংস্কৃতি ও নব্য চেতনার প্রভাব গল্পের জগতকে বাস্তবমুখী করে তোলে। তারপর রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে 'ছোটগল্প' কথাসাহিত্যের আধুনিক ফর্ম হিসাবে শিল্পীত রুপ লাভ করে। এই সাহিত্য শাখা ত্রিপুরার বাংলা কথাসাহিত্যের বিকাশেও বিশেষ ভুমিকা পালন করে চলেছে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অবস্থিত সাতবোন হিসাবে পরিচিত সাতটি রাজ্যের একটি হলো ত্রিপুরা। এই রাজ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা ও আগ্রহে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এখানে বাংলা সাহিত্য চর্চার হাতেখড়ি হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কাব্যচর্চাই ছিল মুখ্য। আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশক থেকে ত্রিপুরায় ছোটগল্প চর্চা শুরু হয়। তারপর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিমল চৌধুরী, সুখময় ঘোষ, মানস দেববর্মন, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য প্রমুখদের হাত ধরে ত্রিপুরায় ছোটগল্প চর্চার ধারা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়।

ত্রিপুরার ছোটগল্প চর্চার বিস্তৃত ভুবনে একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব হলেন সুজয় রায়। পঞ্চাশের দশকের এই গল্পকার তার অসাধারণ প্রতিভায় ত্রিপুরার গল্পবিশ্বে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তিনি সমকালের সমাজ বাস্তবতাকে তার ছোটগল্পের ভেতরে শিল্পকুশলতায় রুপায়িত করেছেন। মানব মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষন, চরিত্র নির্মান, কাহিনী বর্ণনার স্বকীয়তায়, যুগোপযোগী সংলাপ ব্যবহার ও শব্দ চয়নে সুজয় রায় তার গল্পসাহিত্যে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তার প্রকাশিত গল্প গ্রন্থগুলি হল- 'এই জীবন এই দাহ'(১৯৭৪), 'শরীর জমিন'(১৯৯৭), 'বধ্যভূমি'(২০০২), 'অন্যমুখ'(২০১৩)প্রভৃতি। বক্ষমান নিবন্ধে সুজয় রায় 'বধ্যভূমি' গ্রন্থের বিশ্লেষণী পাঠে নিবিষ্ট হয়েছি। এই গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলি হল- 'উত্তরাধিকার', 'ফাটল', 'শেকড়ের দিকে', 'উজানের নাবিক', 'অন্তহীন অনন্ত', 'নবমী নিশি', 'জলপ্রতীমা', 'বধ্যভূমি', 'শতরঞ্চি'।

উত্তরাধিকা: 'বধ্যভূমি' গল্পগ্রন্থ সুজয় রায়ের এক অনন্য সৃষ্টি। বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে উগ্রবাদের সমস্যা ও ১৯৮০ সালের জাতিগত দাঙ্গা ত্রিপুরার পবিত্র অঙ্গনে যে ভয়াবহতার ছাপ ফেলেছিল তাকে প্রেক্ষাপটে রেখে রচিত হয়েছে গল্পকথক সুজয় রায়ের অন্যতম গল্প সংকলন 'বধ্যভূমি'র প্রথম গল্প 'উত্তরাধিকার'। গল্পটির অন্তর্বয়নে ব্যক্তিজীবনের অন্তহীন ভালবাসার প্রতিবেদন যেমন রয়েছে, তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে ১৯৮০ সালের দাঙ্গা, উগ্রবাদ সমস্যা গল্পের মৌল আকল্প হয়ে উঠেছে। গল্পে শহরবাসী যুবক অপরেশ চাকুরীসূত্রে ত্রিপুরার পাহাড়ে আদিবাসীদের মাঝে এসে আশ্রয় নেয়। অপরেশের মধ্যে শহর থেকে পাহাড়ে এসে বসবাসের মধ্যে দ্বিবাচনিক টানাপোড়েন যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি লেখক গল্পের ছলে অপরেশ চরিত্রের অন্তঃপুরের চিত্র উদঘাটন করে মানব প্রেম মনস্তত্ত্বের দুটি বৃহৎ দিকের উন্মোচন করেছেন। অভ্যাস এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা মানব মনের বিশেষ দিকের নিয়ন্ত্রক। আর সেই দিকটিই গল্পে মুখ্য ভূমিকার নির্দেশনা দিয়েছে।

বাঙালি অপরেশের পাহাড়ের মাঝে মন বসে না, পাহাড়িদের মাদকাসক্তি সে অপছন্দ করে। অকারণ যন্ত্রণায় ছটফট করে। কিন্তু এই যন্ত্রণার মাঝেই ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোলে অপরেশ শান্তি খুঁজে পায়। এখন অপরেশ মানুষের সাথে মিশে গেছে। তাদের বাড়িতে সে যায়। প্রসঙ্গত, একসময় বেকার জীবনে কিছু করতে না পারার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিত অপরেশ। এই কারণেই অপরেশ:

"এইসব অনুভুতি গায়ে লাগিয়ে অনুভব করত বলেই জুতোর তলি খুইয়ে একটা চাকরী উদ্ধার করেছিল।"[১]

অপরেশের প্রেমিকা হলো নীতা। কিন্তু সে শহরবাসী। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা কিভাবে মনের দূরত্ব বৃদ্ধি করে, এটা মানব মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মানব মনের এই মনস্তত্ত্বকে লেখক খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন গল্পের দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই দূরত্বই নীতার প্রতি অপারেশের ভাবনা বদলে দেয়।

অপরেশ চাকরি পাবার পর নীতাকে বললে নীতা যা বলেছিল তা অপারেশের কাছে বিদ্রুপ আকার ধারণ করেছে। অপরেশ নীতার দিকে তাকিয়ে ভাবে:

"নীতা যেন অভিনয় করছে। সে যেন বলতে চাইছে, কেরানী? সেটা আবার চাকরী নাকি।"[২]

অন্যদিকে অপারেশের সহকর্মী ক্ষেত্রমোহনের স্ত্রী ও সন্তানকে কেন্দ্র করে লেখক প্রেম মনস্তত্ত্বের আরেকটি বিশেষ দিকের চিত্রানঙ্কন করেছেন। সান্তনা নীতার বান্ধবী। সান্তনার মধ্যে অপরেশ যেন নীতারই অপর পিঠ আবিষ্কার করেছে। অপারেশের নীতার কাছে যা চাইবার কথা ছিল অথবা পাবার কথা ছিল, তাই যেন সে পেতে চেয়েছে সান্তনার কাছে। অপরদিকে সান্তনাও স্বামী ক্ষেত্রমোহনের কাছে মূল্যহীন। ফলে অপরেশের প্রতি তার অবচেতন মনের বাসনা জাগে। অপারেশের প্রতি একটা মন্তব্যে সান্তনার প্রেম মনস্তত্বকে লেখক তুলে ধরেছেন:

"ছেলেটা যদি আপনার সান্নিধ্য পেয়ে বড় হত আমি তৃপ্তি পেতাম।"[৩]

অন্যদিকে অপরেশ:

"কিন্তু ঐ ঘটনার পর এখন আর বদলীর আগ্রহ বোধ করেনি কেন অপরেশ নিজেও জানে না।"[৪]

লেখক অপরেশ ও সান্তনার মানব মনের অনাবিষ্কৃত তত্ত্বকেই উন্মোচিত করেছেন।

অপরদিকে গল্পের প্লটে নির্মিত হয়েছে ত্রিপুরার জলজ্যান্ত সমস্যা উগ্রপন্থী হানার চিত্র। উগ্রপন্থীর আক্রমণে রেবতীমোহনের পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। অপরেশ উগ্রপন্থী হানার কথা শুনে রেবতীমোহনের বাড়িতে গিয়ে দেখে রেবতী বাড়িতে একটি কোণে কাঁঠাল গাছের মধ্যে বাঁধা আর ক্ষেত্রমোহন দরজার চৌকাঠে পড়ে আছে মৃত অবস্থায়।

"ঢুকেই অপরেশ দেখে রেবতীমোহন বাড়ির এক কোণে কাঁঠাল গাছে বাঁধা কিন্তু বুকের কাছে জমাট রক্ত। অনেকক্ষন আগেই মৃত। ক্ষেত্রমোহন দরজার কাছে চৌকাঠে উপুড় হয়ে পড়ে আছে নিস্প্রাণ। সান্ত্বনা ঘরের ভিতর মাটিতে। হাত দুটো খাটের দিকে প্রসারিত।"[৫]

গল্পকথার বয়নে আলোচ্য 'উত্তরাধিকার' গল্পে লেখক একদিকে যেমন সমকালীন ত্রিপুরার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা উগ্রপাদকে দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি সমাজের অবক্ষয়কেও গল্পের অন্তর্বয়নে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি মানবপ্রেম মনস্তত্ত্বকে উদঘাটিত করার যে অনন্য প্রয়াস দেখিয়েছেন তাতে কথকের বয়নরীতির প্রশংসা করতেই হয়।

ফাটল: 'ফাটল' গল্পের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের চিত্র লেখকের কুশীলব বর্ণনায় অন্য মাত্রা পেয়েছে। গল্পের নায়ক উদয় শংকর চরিত্রের স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে লেখক একদিকে পবিত্র প্রেম, প্রেমের ভাঙ্গন, বিশ্বাসঘাতকতা, সামাজিক অবক্ষয় যেমন দেখিয়েছেন, অন্যদিকে আগরতলা শহরের তৎকালীন চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। উদয় শংকরের স্মৃতিচারণায় গল্পের শুরু হলেও একে একে ঊর্বশী, মনোরঞ্জন এবং প্রসেনজিৎ চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্প পরিণতি লাভ করে।

উদয় শংকরের স্মৃতিতে ভেসে উঠে অতীত প্রেমিকা উর্বশীর চিত্র। সেই তার কাছে প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা। কিন্তু উর্বশী কেবল স্বার্থের জন্য উদয়কে ব্যবহার করে গেছে। যার প্রমাণ মিলে তারই বক্তব্যে-

"ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ও নিজেই ছিল একটা হ্যাংলা ছেলে। আমার সঙ্গেই ঘুরঘুর করতো। কথাবার্তাও মিন মিনে, কোনো ঝাঁজ থাকতো না। কোনো কালেই মেয়েরা এসব ছেলেদের পছন্দ করে না। আমি অবশ্য বাধ্য হয়েই করেছি। আগরতলা শহরে তখন নতুন তো? সেম ইয়ারের ছেলেদের মধ্যে তাই উদয়শংকরকেই ভর করলাম। বুঝলাম একে দিয়ে ভয় নেই। কারণ এর শিংও নেই, দাঁতও নেই।"[৬]

এ যেন সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয়েরই একটি রুপ। ঊর্বশী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর নারীদের চিহ্নিত করেছেন। যাদের কাছে ভালোবাসার কোন মূল্যবোধ নেই। হৃদয়ের ফাটল ধরাতে যাদের বাঁধে না। পাশাপাশি গল্পে উঠে এসেছে প্রসেনজিৎ এর মত চরিত্রহীন কামলোলুপ পুরুষ চরিত্রের কথা। যার সাথে সম্পর্ক গড়ে ঊর্বশী গর্ভবতী হয়। কিন্তু সে সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। আসলে শরীরী চাহিদা যে বেশিদিন থাকে না, কামরস নির্গমনের মধ্য দিয়েই যে সেই চাহিদার পরিসমাপ্তি ঘটে তাকেই লেখক অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু তবুও প্রসেনজিৎ এর মত পুরুষরাই ঊর্বশীদের মতো নারীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠে। তাইতো উর্বশী তার তলপেটে ফাটল চিহ্ন দেখে প্রসেনজিতের কথা ভাবে। আর উদয়ের মত পুরুষরা চিরতরে হারিয়ে যায়। গল্পের শেষে দেখা যায় রবীন্দ্রভবনের বেদীতে অপেক্ষারত উদয় শংকরের সঙ্গে দেখা না করেই উর্বশী প্রসেনজিতের সাথে দেখা করে চলে যায়। এভাবেই কিছু ভালোবাসা নীরবে প্রাণ হারায়, বিশ্বাসে ফাটল ধরে। লেখক সমাজের আপাত সৌন্দর্যের পেছনকার মলিনতার রূপটিকে এভাবেই অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতায় চিত্রাঙ্কন করেছেন। গল্পে পারস্পারিক প্রেম-ভালোবাসার মধ্যেও গড়ে ওঠা স্বার্থপরতার যে চিরন্তন দেওয়াল রয়েছে তাকে বাস্তবসম্মত রূপ দিতেই যেন গল্পটির আয়োজন করেছেন গল্পকার সুজয় রায়।

শেকড়ের দিকে: সুজয় রায়ের 'শেকড়ের দিকে' গল্পটি বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। দুটি পরিবার যথাক্রমে শিবানী, তাপস ও ছেলে বিট্টু এবং পলাশ, তাপসী ও রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে লেখক লোভ বশবর্তী দুটি পরিবারের সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র পরিস্ফুট করেছেন। অর্থের লোভ কিংবা স্বার্থের লোভ যাই হোক না কেন, তা যে একটি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশে অন্তরায় হয়ে উঠে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলোচ্য গল্পেও দেখা যায় লোভ বশবর্তী হয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের চরম পরিণতি। তাপস উচ্চপদস্থ ব্যবসায়ী। অর্থের প্রতি লোভ তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। সে তার স্ত্রী শিবানীকে সন্দেহ করে। শিবানীর প্রতি তাপসের বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে 'অসভ্য জানোয়ার' শব্দগুলির উচ্চারণের মাধ্যমে। লেখক শিবানী ও তাদের পরিচারিকা শিফন এর কথোপকথনের মাধ্যমে একটি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করান পাঠকদের। শিফন জিজ্ঞাসা করে:

"মাসী। একটা কথা কমু? আপনাগোর তো টাহাপয়সার অভাব নাই, তবে অত অশান্তি কেরে।"[৭]

এর উত্তরে শীবানী বলে:

"এর লাইগ্যাই তো অশান্তি। আমি লোভে পইর্যা গেছি। ঐ টাকাপয়সার লোভ।"[৮]

অন্যদিকে শিবানীদের বাড়ির নীচের তলায় পলাশ ও তাপসীর পরিবারের বাস। এখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থলোভের বলি তাপসী নিজেই। কিন্তু তাপসী স্বাবলম্বী হলেও সে মাদকাসক্ত। অর্থের প্রতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকায় তাপসী কম আয় করা চাকচিক্যহীন তার স্বামীকে সে অপছন্দ করে। সে স্বামীকে রীতিমতো মানসিক

দিক দিয়ে হয়রানিও করতো। তাপসীর মানসিক নির্যাতনে তাপসের মুখে চিরন্তন নির্যাতিত এক পুরুষের বাণীই প্রকাশিত হয়েছে:

"অসভ্য জানোয়ার। আমার ঘরটা শেষ করে দিলো।"[৯]

পলাশের পরিবারে পরিচারিকার কাজ করতো অনাথ। পলাশদের সাংসারিক অশান্তি দেখতে পেয়ে পলাশকে সে জিজ্ঞেস করে:

"দাদাবাবু আপনাগোর সংসারে এমন চেহারা কেরে? আমার মাঝে মাঝে ডর লাগে।"[১০]

যখন দুটি শিক্ষিত, অবস্থাসম্পন্ন, সভ্য, আধুনিক তকমাধারী পরিবার লোভের বশবর্তী হয়ে অশান্তির গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায় তখন সেই দুটি পরিবারের পরিচারিকা হিসাবে কাজ করা শিফন ও অনাথ শুধুমাত্র তাদের ভালবাসার সম্বল করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় বগলে দুটি পুটলি নিয়ে। তারা প্রমাণ করে যে অর্থই সব নয়। ভালোবাসা, শান্তি, সৎ, বিশ্বস্ত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে শিফন ও অনাথ।

উজানের নাবিক: 'উজানের নাবিক' গল্পটিতে সুজয় রায়ের সমাজ মনস্কতার এক অসামান্য পরিচয় মেলে। গল্পের কথক ও ধ্রুব চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজ অবক্ষয়ের চিত্রকে বাস্তবিক পটে চিত্রিত করেছেন। শহরবাসী এই শ্রেণীর যুবকরা সিগারেট, মদ, নারী সঙ্গকেই নিত্য জীবনের অঙ্গ হিসেবে মনে করে। কথকের বয়ানেই আমরা এই শ্রেণীর পুরুষদের অন্তরের কলুষ চিত্রটি দেখতে পাই।

"দাদা, প্রেম বলুন, নারীসঙ্গ বলুন-সবই টাকার অঙ্কের খেলা। এর বাইরে সবটাই অসার।"[১১]

কথক রুচি নামক একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক করে শেষ পর্যন্ত অর্থের লোভে মন্দিরার সাথে ঘর করেন। কথকের এই স্বার্থপরতা, নারী বিলাসিতা, চরিত্রহীনতার কথা জানতে পেরে মন্দিরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ধ্রুব বলে:

"মরববেই তো? বউকে কষ্ট দিলে সে আর তা কতদিন সহ্য করবে? এটা রুচির প্রতি রুচিহীন থাকার প্রতিশোধ।"[১২]

মন্দিরা রেখে গেছে একটি পুত্র সন্তান। পিতার প্রতি তার অনেকটাই ক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত, মৃত্যু চিন্তায় মগ্ন কথকের জীবনে যেদিন সত্যিই মৃত্যু আসে তখন হিন্দু শাস্ত্র মতে কথকের পুত্র দাহকার্য করলেও পিতার প্রতি ধিক্কার জানায় সে। কথকপুত্র বলে:

"আমার জন্মদাতাকে আমি চিনি না। দেখিওনি কোনদিন। সবার কাছে আমার এটাই হবে শেষকথা।"[১৩]

পাশাপাশি গল্পে উঠে এসেছে ত্রিপুরার এক রূঢ় বাস্তবতা। বাংলাদেশ যুদ্ধের পর যারা উদ্বাস্তু পরিচয় নিয়ে ত্রিপুরায় ঢুকেছিল তারাই নানা কৌশলে আগরতলার অভিজাত দলে নাম লিখেছে। কথক ও ধ্রুবর কথোপকথনে এই চিত্রটিও গল্পে বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। এইভাবেই লেখক সামাজিক অবক্ষয়ের এক বিশ্বাসযোগ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন আলোচ্য 'উজানের নাবিক' গল্পে। লেখক কথ্যছলে সমাজের অবক্ষয়ের যে ধ্রুব বাস্তবিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তাছাড়া শহরবাসী যুবকদের চিন্তা চেতনার কিংবা তাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চার কলুষিত দিকটি যেভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাতে লেখকের অমূল্য চয়নরীতির প্রশংসা না করলেই নয়।

নবমীনিশি: সুজয় রায়ের গল্পগ্রন্থ 'বধ্যভূমি'-র একটি অন্যতম গল্প হল 'নবমীনিশি'। গল্পটির প্রারম্ভে দেখা যায় লেখক সুজয় রায় প্রকৃতির অনুষঙ্গে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নবমীর রূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যতই গল্পমূলে প্রবেশ করা যায় সেখানে গল্পশরীরের নির্মিতিতে উঠিয়ে এনেছেন তৎকালীন ত্রিপুরার জ্বলন্ত সমস্যা উগ্রপন্থার এক বাস্তব নিটোল চিত্র।

আলোচ্য গল্পের নায়িকা নবমীনিশি ত্রিপুরা। এই নামটি তার ঠাকুরদার দেওয়া। তার জন্ম নবমীর রাতে হয়েছিল বলে নাম রাখা হয়েছিল নবমী নিশি। নবমীদের পাড়ার মাথা ছিলেন তার বাবা। সেই পাড়ায় নবমী ছিল এক স্বাধীনচেতনা বোধসম্পন্ন নারী, তার মধ্যে প্রতিবাদী মানসিকতাও ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান ছিল। নবমীর উগ্র মানসিকতাকে এবং স্বাধীন চিন্তাধারাকে গ্রামের সবাই মেনে চলত। তাকে পাড়ার সবাই একদিকে যেমন ভয় করতো অন্যদিকে তার প্রতি সকলের নির্ভরতাও ছিল অধিক। তাকে উদ্দেশ্য করে পাড়ার মানুষ বলতো:

"তুই তো নবমীনিশি। বিসর্জনের ছুয়ন তোর মধ্যে নাই। তুই যেইখানে লাগস জিইত্যা আয়স।"[১৪]

নবমীর জীবনে একজন ভালোবাসার মানুষও ছিল, সে হল তার বন্ধবী বিশালকন্যার ভাই নবকুমার। নবমী বিশালকন্যার বাড়িতেই প্রথম নবকুমারকে দেখে। এরপর থেকেই নবমীর সামনে এসে নবকুমার দাঁড়ালে নবমীর মনে জেগে উঠে প্রেমের বিহ্বলতা। কিন্তু নবমী কখনো নবকুমারকে মুখ ফুটে বলতে পারেনি সেকথা। নবকুমার নবমীকে কাছে পেতে চায়, তার শরীরের সুন্দর স্নিগ্ধ গন্ধে নবকুমার আত্মহারা হয়ে যায়। নবমীও বিচলিত হয়ে উঠে।

নবকুমারের জীবনচর্চা সম্পর্কে নবমী মোটেই অবগত ছিল না। সে কিভাবে জীবনের প্রতিটি দিন অতিবাহিত করে, সে সম্পর্কে নবমী ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। নবকুমার স্কুলে পড়াশুনা করতো, রোজ স্কুলে যেত কিন্তু এখন আর স্কুলমুখো হয় না, সারাক্ষন সে কোথাও ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতিপ্রেমী, মানবদরদী, ছোট ছোট জিনিসে আনন্দ খুঁজে নেওয়া নবমী হঠাৎই ঘটে যাওয়া একটি বীভৎস ঘটনার অভিঘাতে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। উগ্রপন্থীর আক্রমনে একটি কমান্ডার জিপ এবং তার যাত্রীদের রক্তাক্ত ভঙ্গুর অবস্থা যখন নবমীকে রাতে ঘুমাতে দিচ্ছে না তখন ঘরের পেছন থেকে হঠাৎ একটি শব্দ সে শুনতে পায়। তখন নবমী ঘরের জানালা ফাঁক করে দেখতে পায় কয়েকটি টর্চের আলো। তারপরই সে শুনতে পায় নবকুমারের কণ্ঠে নবমী ডাক। কিন্তু এই ডাক যে প্রণয়িনীর সাথে লুকিয়ে সাক্ষাৎ করার ডাক নয় এটা ঠিক নবমী বুঝতে পারে যখন নবকুমার বলে:

"চুপ। কথা কইয়োনা। আমার লগে অনেক লোক। আমডার দলের কয়জন। আর দুটো বাইরের।"[১৫]

নবকুমারের সাথে বার্তালাপে নবমী বুঝতে পারে নবকুমার উগ্রপন্থার দলের সাথে যুক্ত। নবকুমার তার দলের অন্যান্যদের লুকিয়ে রান্না করে খাওয়ানোর জন্যই নবমীর কাছে এসেছিল। কিন্তু এখানেই নবমী দীপ্ত কণ্ঠে তার প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে স্পষ্ট জানায় যে, অপহরণকারী এবং হত্যাকারীদের জন্য তার মনে বা বাড়িতে কোনো স্থান নেই। আসলে নবমী ছিল চিরদিনের প্রতিবাদিনী মানসিকতার পরিচায়ক। তবু প্রেমের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস ও ভরসা রেখে নবমী তার প্রেমিক নবকুমারের দিকে সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। পরক্ষণেই নবমী দেখতে পায় আলোর সামনে ভেসে উঠে নবকুমারের দলের অন্যান্য লোকেদের ছবি যাদের মধ্যে কারো মুখ ঢাকা কাপড় দিয়ে, কারোর জামায়, শরীরে ও মুখে রক্তের দাগ।

নবকুমার তার দলের অন্যান্যদের রান্না করে খাওয়ানোর জন্য নবমীকে বারবার বললে নবমী রাগে ক্ষোভে নবকুমারকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে:

"আমি পারতো না। আগেই কইছি। অখন অন্য কোথায়ু যাও। তোমরা মানুষ খুন করবা, আর আমি তুমডারে রাইন্দা খাওয়ামু ? আমারে পাইছো কি?"[১৬]

গল্পপাছে লক্ষ্য করা যায় নবকুমার এবং তার দলের লোকজন কিছু মানুষ অপহরণ করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রতিবাদিনী নবমী নবকুমারের সেই কর্মকান্ডকে শায় দিতে নারাজ। কেননা সে ছিল একজন স্বাধীন চেতনার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। সেই পরিস্থিতিতে নবমী তার ভালোবাসার মানুষটিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে ও একান্তে নবকুমারকে বোঝায়।

"নব, অখনও সময় আছে তুমি মানু গুলোরে ছাইড়া দাও। তুমিও পালাইয়া যাও। আমি সাহায্য করুম।"[১৭]

এমতাবস্থায় সেই দূর্যোগপূর্ণ মুহূর্তের মধ্যেও নবকুমার তার প্রেমিকা নবমীর গায়ের বনজ ফুলের সেই মিষ্টি গন্ধের ছোয়ায় সেই সমস্ত ভয় দ্বিধাকে দূর করে নবমীকে নিজের করে পাবার আশায় বন্দীদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। নবমীর প্রেমের প্রতি নায়ক নবকুমারের অফুরান ভালোবাসাকেই এখানে গল্পকার বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে এনেছেন। উগ্রপন্থীর জ্বলন্ত সমস্যার মধ্যেও নবমীর মতো স্বাধীন চিন্তাধারার মানুষদের ভালোবাসার পরশে কিভাবে নবকুমারের মতো অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত মানুষেরা রক্তের খেলা বন্ধ করে ছড়িয়ে দেয় প্রেমের মতো চরম সত্যতার সুহাস, সেই দিকটিকেই লেখক দেখিয়েছেন।

কিন্তু গল্পের শেষ পরিণতি সুখময় হতে পারেনি, গুলিবিদ্ধ হয় নবকুমার। অপহরণ করে আনা দুইজনকে সে পালিয়ে যাবার কথা বলে এবং সে নিজেও চতুরতার সাথে দল থেকে আলাদা হয়ে যায়। নবমীকে সে ফিসফিস করে বলে:

"মানুষ দুইটারে পালাইয়া যাইতে কইছি নবমী। রাস্তাটা দেখাইয়া দিও। আমিও যামুগা। তবে আমি ফিরা আমু।"[১৮]

নবমীর নিশি বরাবরই আনন্দের হয়। সমগ্র পৃথিবী নবমীর রাতে সাক্ষী হয়ে থাকে দুটি মানব মানবীর আনন্দে উল্লাসে কাটানো মুহূর্তের। কিন্তু পরক্ষণেই নবমী নিশির সেই আনন্দের মুহূর্ত কেটে নেমে আসে চরম অন্ধকার। নবমী শুনতে পায় অসংখ্য গুলির শব্দ। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে নবমী দেখতে পায় তার প্রেমিক নবকুমার গুলিবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে। গল্পের শেষে গুলিবিদ্ধ নবকুমার নবমীর আতঙ্কিত ডাকে মুখের মধ্যে এক মলিন হাসি নিয়ে বলে:

"মানুষ দুইটারে ভাগাইয়া দিছি নব। আমি আমু কইছে না? বাইচ্যা আইতে পারছে না। আমারে মাফ কইরা দিয়ো।"[১৯]

প্রেমিকের এমতাবস্থায় নবমীর মনের সমস্ত ক্রোধ যেন নবকুমারের হত্যাকারীদের উপর গিয়ে পড়ে। সে যেন সেই অন্ধকারের মধ্যেই হত্যাকারীদের ধরে এনে তার প্রতিশোধ নেবে, আর এটাই যেন তার প্রতিজ্ঞা।

আলোচ্য গল্পে নবকুমার অনেক দেরিতে হলেও উপলব্দি করতে পেরেছিল যে হিংসা নয়, ভালোবাসাই হলো বাঁচার একমাত্র রাস্তা। গল্পকথার বয়নে আলোচ্য গল্পটিতে গল্পকার সুজয় রায় তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাবের প্রকাশ করেছেন। লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন হিংসা-বিদ্বেষ কিংবা রক্তের খেলা নয়, তারও উর্ধ্বে উঠে প্রেম ও ভালোবাসাকে হাতিয়ার করে কিভাবে জীবনের আনন্দ ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে জগতের পরম স্বাদ আস্বাদন করা যায়। ফলে সহজ সরল কথ্য বয়নে লেখকের অনন্য প্রতিভার প্রশংসা এখানে করতেই হয়।

কথাকার সুজয় রায় সাহিত্য রচনার সাধনায় যেভাবে ব্রতী হয়েছিলেন তাতে তার সমগ্র জীবনদৃষ্টির বৈচিতর্য্য পরিলক্ষিত হয়েছে। জীবনের পথ চলার সাথে সাথে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তাকেই তিনি তার ছোটগল্পে শিল্প মাধুর্যতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তার রচনায় যেমনভাবে চোখে দেখা জীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে তেমনি সেই অভিজ্ঞতা তার জীবন দর্শনের রসে জড়িত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অনুভূতিময় জগত। এই জগতে সাধারণ, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বাস্তব জগতের ওম্ মেখে সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। তাই কাহিনীর পাশাপাশি চরিত্রগুলিও যথাযোগ্য সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে গল্পগুলোর পটভূমিকায় চিত্রায়িত হয়েছে। তাছাড়াও কথাকার গল্পগুলোতে যে ভাব ও ভাষার রূপরেখা নির্মাণ করেছেন তাতে সহজ সরল বয়নরীতির স্পষ্ট উল্লেখও পাওয়া যায়। যা পাঠক মহলে অভূতপূর্ব সারা ফেলে দেয়।

তথ্যসূত্র:

1) দ্রঃ 'বধ্যভূমি' -সুজয় রায়, ২০০২, আবহমান, আগরতলা ত্রিপুরা, পৃঃ৮।
2) দ্রঃ তদেব, পৃঃ১০।
3) দ্রঃ তদেব, পৃঃ১৫।
4) দ্রঃ তদেব, পৃঃ১৫।
5) দ্রঃ তদেব, পৃঃ১৫।
6) দ্রঃ তদেব, পৃঃ২১।
7) দ্রঃ তদেব, পৃঃ২৬।
8) দ্রঃ তদেব, পৃঃ২৬।
9) দ্রঃ তদেব, পৃঃ২৯।
10) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৩২।

11) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৩৩।
12) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৩৬।
13) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৪৪।
14) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৪৬।
15) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৪৭।
16) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৪৭।
17) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৪৮।
18) দ্রঃ তদেব, পৃঃ৪৮।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) রায় সুজয়, বধ্যভূমি, আবহমান, আগরতলা ত্রিপুরা, ২০০২।